ইমরান খান

পাকিস্তান: আমার ইতিহাস

অনুবাদ
শাইখুল ইসলাম

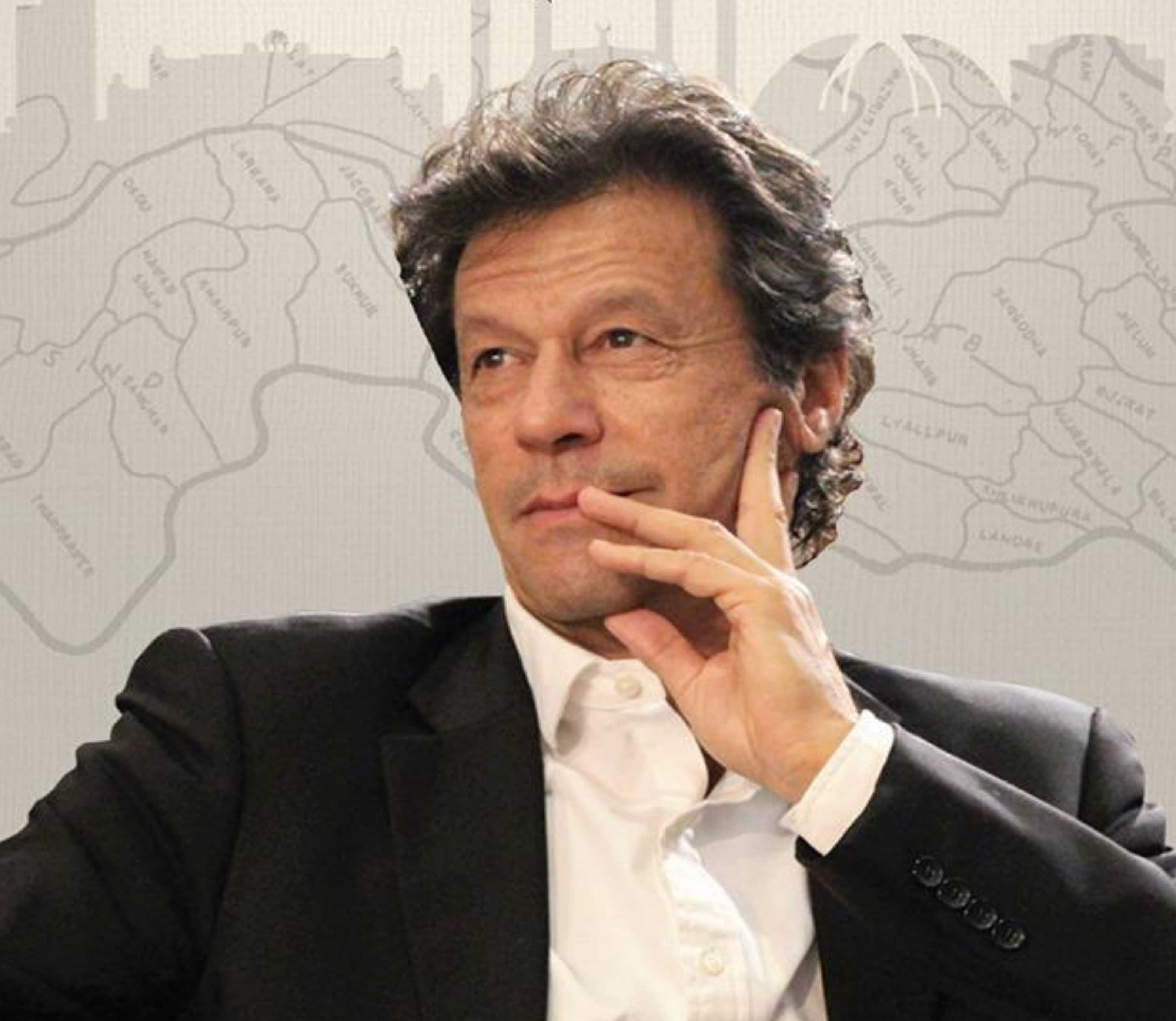

পাকিস্তান : আমার ইতিহাস

ইমরান খান
অনুবাদ : শাইখুল ইসলাম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

অনুবাদকের কথা

আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের পশ্চাদপদতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূল কারণ, এবং এগুলোর বাস্তব সমাধান প্রসঙ্গে ইমরান খান যেসব কথা বলেছেন, তা মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আপাদমস্তক ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত ইমরানের ইসলামের দিকে ফিরে আসা এবং তার উপমহাদেশীয় পরিবারিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মায়ের নামে ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান পাক-ভারত উপমহাদেশের হাজার হাজার তরুণের মনে উৎসাহ জাগাবে। ইমরানের পেশাগত জীবনের উত্থন-পতন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তরুণদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকা, দৃঢ় মনোবল, সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বোপরি সকল কাজে মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। ইমরান তার জীবন অভিজ্ঞতা লব্ধ এসব কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য হাতেকলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন। লিখেছেন আত্মজীবনী 'Pakistan : A Personal History'।

হাজারও তরুণের কাছে ইমরান ক্রিকেট মাঠের অধিনায়ক এবং বিশ্বকাপ বিজয়ী নায়ক হিসেবে বিবেচিত। তার প্রতি আমি ফোকাস রাখা শুরু করেছিলাম ক্যারি প্যাকারের রঙ্গীন পোশাকে ক্রিকেট খেলা শুরুর সেই দিনগুলো থেকে। তারপর ভারত, ইংল্যান্ড, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ সফর, নেহেরু কাপে তার বিরোচিত নেতৃত্ব দেখেছি। ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপের উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় সাধারণ মানের এক পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইমরান যেভাবে একের পর এক বিরত্বপূর্ণ বিজয় ছিনিয়ে এনে দিয়েছেন, তাতে তার প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও দায়বদ্ধতার এক অনন্য নমুনা ফুটে উঠেছে। পশতুন শৌর্য ও নেতৃত্বের গুণাবলির সাথে যেন আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও শালীনতার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এই আত্মজীবনীতে ইমরান খানের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে পাকিস্তানি ও বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে; বিশেষত মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত ঘটনাবলি। ইমরান পুরো বই লিখেছেন ধারা বর্ণনার স্টাইলে এবং প্রয়োজনীয় ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ-সুলভ মতামত দিয়েছেন। বইটির প্রতিটি পাতায় পাঠকবৃন্দ ইমরানের উদারনৈতিক চিন্তাধারা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং সবার ওপরে মানবিকতাকে স্থান দেওয়ার মানসিকতাকে খুঁজে পাবেন। ইমরান একজন গর্বিত মুসলমান। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, প্রকৃত ইসলামি আদর্শের মধ্যেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও বৈশ্বিক জীবনের মুক্তি নিহিত। তিনি গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, আইনের শাসন,

সহনশীলতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর আস্থাকে সবকিছুর ওপর স্থান দিয়েছেন এবং যেকোনো দেশের এগিয়ে চলার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে সারাবিশ্বে এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইমরান যে কর্মসূচি পেশ করেছেন, তা এক কথায় অনন্য।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইমরানের বিভিন্ন মন্তব্যে তার সুবিবেচনাবোধ ফুটে উঠেছে। তৎকালীন পাকিস্তানের এ অঞ্চলের জনগণের প্রতি শাসকশ্রেণীর বিমাতাসুলভ আচরণকে তিনি সাধারণ মানুষদের প্রতি অভিজাত গোষ্ঠী কর্তৃক চিরাচরিত বঞ্চনার মনোভাব বলে মনে করেন। ইমরানের ভাববাদ ইকবালের চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। ইকবালের বাণীর মাঝেই তিনি পাকিস্তান তথা মুসলিম উম্মাহর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে তার পরিকল্পনা এই বইতে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তার চিন্তা ও কর্ম পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ; তা সত্ত্বেও জীবন চলার পথে যেসব ভুল করেছেন, সেগুলো অকপটে স্বীকার করেছেন। এতে রাজনীতিবিদ হিসেবে তার সততা ও আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে। তার নেতৃত্বে পাকিস্তান এগিয়ে যাবে এবং তার সততা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ ও আদর্শ সমাজ গঠনে নেতৃত্বদানে ইচ্ছুক উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের জন্য বইটি এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

(কেন অনুবাদ করলেন? কতদিন লেগেছে অনুবাদে, কী কী বিষয় আছে ভেতরে, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে কীভাবে সংযুক্ত হলেন– এসব পয়েন্ট এখানে থাকা উচিত, এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ প্রদান)

শাইখুল ইসলাম

পুস্তক পরিচিতি

১৯৪৭ সাল। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র পাঁচ বছর পর ইমরান খানের জন্ম। পাকিস্তানের ইতিহাসের সাথেই তার জীবন বিবর্তিত হয়েছে। অর্থ ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ দেশের অভিজাত শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক অবদমিত পাকিস্তান বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর ইসলামি দেশ; তবুও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও আপন মিত্র আমেরিকার নিয়মিত বোমা হামলা থেকে নিজ জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম। পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেনকে অনেক বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছে– এমন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে এখন আমেরিকার সাথে সম্পর্ক কেবল খারাপের দিকেই যাবে। কীভাবে পাকিস্তান অবিচার ও অস্থিতিশীলতার শেষ প্রান্তে এমন এক সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিণতিতে পৌঁছল?

ইমরান খান আপন স্মৃতি-প্রিজমে প্রতিসরিত তথ্যকণিকার আলোতে দেখা দেশের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। পতনোন্মুখ ব্রিটিশ রাজের সময়কালে রচিত দেশের বুনিয়াদি ধারণা থেকে তিনি শুরু করেছেন। মুসলিম বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এসব বিষয়ে নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখার পাশাপাশি সাধারণ পাকিস্তানিদের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন।

ইমরান নিজের পারিবারিক ইতিকথা এবং দেশের আনাচে-কানাচে তার ব্যাপক সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, ‘পাকিস্তান : আমার নিজের ইতিহাস’ বইতে অনন্য এক অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের কাছে অপরিচিত ভিন্ন এক পাকিস্তানকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের এই বুনন থেকে আমরা ইমরান খানের ব্যক্তিগত জীবন – লাহোরে সুখী শৈশব, অক্সফোর্ডে শিক্ষাজীবন ও অসাধারণ ক্রিকেট ক্যারিয়ার, জেমিমা গোল্ডস্মিথের সাথে বিয়ে, তার জীবনে মায়ের প্রভাব ও ইসলামি বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারব। ইমরানের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত ঐতিহাসিক পর্বের আখ্যান এবং বর্তমান জনহিতকর ও রাজনৈতিক কার্যক্রম, উভয় বর্ণনাই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তার লেখনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

সূচিপত্র

অধ্যায়–১ : বেহেশতেও কি ক্রিকেট খেলতে পারব? (১৯৪৭-১৯৭৯)

অধ্যায়–২ : বিপ্লব (১৯৭৯-১৯৮৭)

অধ্যায়–৩ : মৃত্যু ও পাকিস্তানে আধ্যাত্মিক জীবন (১৯৮৭-১৯৮৯)

অধ্যায়–৪ : আমাদের ব্যর্থ গণতন্ত্র (১৯৮৮-১৯৯৩)

অধ্যায়–৫ : ‘ছদ্মবেশী ফেরেশতা’ হাসপাতাল নির্মাণ (১৯৮৪-১৯৯৫)

অধ্যায়–৬ : আমার বিয়ে (১৯৯৫-২০০৪)

অধ্যায়–৭ : সেনাপতি (১৯৯৯-২০০১)

অধ্যায়–৮ : ৯/১১ হামলার পর পাকিস্তান

অধ্যায়–৯ : উপজাতীয় অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ : আমার সমাধান

অধ্যায়–১০ : ইকবালকে নতুনভাবে আবিষ্কার

অধ্যায়–১১ : পরিশিষ্ট : নয়া পাকিস্তান (২০১২-২০১৯)

অধ্যায়—১
বেহেশতেও কি ক্রিকেট খেলতে পারব?
(১৯৪৭-১৯৭৯)

পাকিস্তানের বাইরে আমি মূলত একুশ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্যই পরিচিত। কিন্তু নিজ দেশে আমি একটি দলের প্রধান, যারা রাজনৈতিক অভিজাতদের প্রাধান্য খর্ব করার সংগ্রামে লিপ্ত। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এ শ্রেণি দেশকে খোদা প্রদত্ত সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে কোণঠাসা করে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট মোশাররফের মতো সামরিক স্বৈরাচার অথবা ভুট্টো ও শরিফের মতো জমিদারপরিবার কর্তৃক পালাক্রমে শাসিত হয়ে পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। একটি ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, বর্তমানে পাকিস্তান এমন এক দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে রাজনীতি হচ্ছে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মতো একটা ব্যাপার। এখানে ক্ষমতাসীন শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জকারী যে কাউকে, এমনকী আমার মতো বহুপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিকেও ইচ্ছামত গ্রেফতার ও সহিংস হুমকি দেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বদেশভূমি হিসেবে এবং ইসলামের সমতা নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান এখনও এক ভঙ্গুর রাষ্ট্র। এর উত্তর-পূবে কাশ্মীর। অঞ্চলটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত, যা স্বাধীনতার পর থেকেই দেশ দুটির মধ্যে সহিংস বিরোধের কারণ, হয়ে রয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ পশতুনের

কেন্দ্রভূমি খাইবার পাখতুনখোয়া ও কেন্দ্র-শাসিত গোত্রীয় অঞ্চলকে[১] জর্জরিত করছে। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল, রূক্ষ, অনাবিষ্কৃত ও বিরল জনবসতিপূর্ণ বেলুচিস্তান প্রদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী তৎপরতায় উত্তপ্ত। দক্ষিণে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের উপকূল ঘেসে আরব সাগর বহমান। সিন্ধুর প্রাদেশিক রাজধানী করাচি বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত। তাদের মধ্যে রয়েছে পশতুন অভিবাসী এবং মোহাজির বা রিফিউজি নামে পরিচিত দেশভাগের সময় সীমান্তের ওপার থেকে আগত মুসলমানদের বংশধরেরা। অন্যদিকে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোকের বাসস্থান পাঞ্জাব পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তি ও সমৃদ্ধির একচেটিয়া সুবিধাভোগী হওয়ায় অন্যান্য প্রদেশের ক্ষোভের কারণ, হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মতে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই আমার দেশের দুর্দশার সূচনা হয়, যখন আমরা আমাদের মহান নেতা জিন্নাহকে হারাই। ‘পাকিস্তান’ অর্থ পবিত্র ভূমি, আমার জন্মের সময় এই দেশের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। দেশ নিয়ে আমরা তখন যারপর নাই গর্বিত ও আশাবাদী ছিলাম। আমরা ছিলাম পতোন্মুখ ব্রিটিশ রাজ্যের হাত থেকে মুসলমানদের জন্য আদায় করে নেওয়া এক নয়া দেশ। আমাদের মন থেকে ছলনাপূর্ণ ঔপনেবেশিক অপমান এবং স্বাধীন ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় দূরিভূত হয়েছে। আমরা হলাম এক মুক্ত জনসমষ্টি, যারা এখন অবাধে উপমহাদেশের মিনারে একসময় পত পত করে উড়া ইসলামি সংস্কৃতির নব উন্মোচন করতে সক্ষম। সমতা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রচিত ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও আমাদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা ছিল- গণতন্ত্র কোনো ধরনের ধর্ম-রাজ নয়। মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আদর্শ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হলে এর মাধ্যমে আমরা অপার সমৃদ্ধি অর্জনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হবো-ন এমনটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। অনেক পরে উপলব্ধি করলাম, আমাদের মতো আনকোরা নতুন দেশেও এমন স্বপ্ন পূরণ করা কত কঠিন যেখানে ঐতিহাসিক কট্টর মনোভাব তখনো দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু বছর পরিক্রমায় আমরা নিজস্ব নিদারূণ ইতিহাস তৈরি করে নিলাম এবং পাকিস্তান সৃষ্টির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমাগত দূরে চলে গেলাম।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিকড় রোপিত হয়। মোটামুটিভাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আরব সাগরের তীরে অবস্থিত সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপকূলভূমি সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলটি ইতঃপূর্বে কখনো পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল না। বরং শতাব্দিকাল ধরে এলাকাটি একের পর এক বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইংরেজরা উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যদিও ১৮৮০ দশক হতে সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশী লক্ষ লক্ষ মানুষের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান।

---

১. FATA (the Federally Administered Tribal Areas)

এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যারা তাদের সংগ্রামের প্রথম দিকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে। ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে চায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বৃটেনকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়। ফলে এ সময় যে সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্ত যেতোনা', তার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতব্যাপী ইংরেজ শাসন অবসানের লক্ষ্যে তাদের সাথে দর কষাকষি করতে থাকে। তারা চেয়েছিল সমগ্র উপমহাদেশ মিলে একটি দেশ হোক। এখান থেকেই দুটি জাতির ইতিহাস ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করে। একটা হিন্দু জাতীয়তাবাদী পন্থা, অন্যটি ১৯২০-৩০ দশক জুড়ে ভারতের বিভিন্ন শহর ও প্রদেশে সংঘটিত সহিংসতা লক্ষ্য করে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুসৃত ভিন্ন পন্থা। এ পক্ষের অংশ হিসেবে বিশেষভাবে দুই ব্যক্তি জিন্নাহ ও আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নয় বছর আগে ইকবাল মারা যান। স্বপ্নদর্শী এ কবি ও দার্শনিকই পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। ১৯৩০ সালে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতি প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন–

> 'আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটি একক রাষ্ট্রে হিসেবে দেখতে চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে বা বাইরে একটি স্ব-শাসিত ও সংহত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম রাষ্ট্রের গঠন আমার কাছে মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাগ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।'

> 'ভারতীয় মুসলমান তার নিজস্ব ভারত ভূমিতে আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোকে পূর্ণতার সাথে এবং বাধাহীনভাবে বিকাশ লাভের অধিকার রাখে।'

এমন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ইকবাল মনে করতেন যে, মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য (খুদি) বিকাশের জন্য এটি অতি আবশ্যকীয় এক পর্যায়।

ইকবাল কেবল একটি স্ব-শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রের চিন্তা করেননি, বরং তাঁর প্রগাঢ় বক্তব্য ভারতীয় মুসলমানদের ঘুম ভেঙে দেয় এবং তাদের সক্রিয় করে তোলে। নিজেদের কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনেবেশিকতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করা নয়, বরং সব ধরনের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের অনুপ্রেরণা জোগান। মানবিক সাম্য, মর্যাদাবোধ, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে মানব জাতির অধিকারের প্রতি একান্ত বিশ্বাস পোষণকারী ইকবাল শক্তিহীনদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর ও মূল্যায়িত হওয়ার প্রেরণা যোগান।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইকবালের লেখনী আমার কাছে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক মনে হলো। কোনো বিবেচনা ছাড়াই একটি স্বাধীন মডেল হিসেবে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি

প্রদর্শণ করেন। এর বিপরীতে তিনি বলেন যে, ইসলামি নিয়ম-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যেকোন সমাজ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, শান্তি ও সাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। ইসলাম বিষয়ে ইকবালের ভাষ্য সংকীর্ণ পরিসরে প্রদত্ত ইসলামের ব্যাখ্যা হতে বহুলাংশে আলাদা। ইকবালের কাছে ইসলাম শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস বা উপাসনা পদ্ধতির নাম নয়। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, বরং এ পার্থক্য জীবনের প্রতিটি মৌলিক চিন্তার দিক দিয়েও।

ইকবাল মনে করতেন, বংশগৌরব বা জাত্যাভিমান মুসলমানদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর মতে, ‘সাম্য, সংহতি ও স্বাধীনতা’ এই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ইসলামে কোনরূপ যাজক বা অভিজাত-তন্ত্র নেই। আর মানুষের যোগ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া (ন্যায়পরায়ণতা)। নবি মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

> ‘মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই, যারা আল্লাহকে ভয় করে।’

অন্য কথায়- যারা মনুষ্যত্ব গুণসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ,তারাই আল্লাহকে ভয় করে। কারণ, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন সে বিশ্বাস করে; একদিন তাঁর কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। তাই সে অনুযায়ী তাকে চলতে হবে।

ইকবালের দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সমষ্টিই ইসলামি কালচার নয়। বরং এটি এক আদর্শিক মানদণ্ড, যার ভিত্তি হচ্ছে কুরআনে সন্নিবেশিত ন্যায়নিষ্ঠ নীতিমালা। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের খোদাপ্রদত্ত সম্ভাবনা পুরোপুরি উপলব্ধি করার নিমিত্তে ইসলাম তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই দর্শনের স্বপক্ষে ইকবাল একটি ‘কর্মের নকশা’ উপস্থাপন করেছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজকে সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিকাশের দিকে চালিত করে।

ইকবাল ছাড়াও যেসব ব্যক্তি মুসলমানদের পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহনের আহ্বান জানান এবং এ উদ্দেশ্যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, (যেমন, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান) তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যতদিন হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে থাকবে, ততদিন একটি আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব হবে না।

তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তাতে কেবল শ্রেণিভেদ প্রথা ও যাবতীয় সামাজিক বৈষম্যই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, বরং এর বাইরেও ইসলামি আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার মতো সাহসী উদ্যোগ ভারতের মতো দেশে অর্জন করা সম্ভব ছিল না, কেননা সেখানে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। এ সময়, ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল ইউরোপীয় ঔপনেবেশিকের শাসনাধীন। ইসলামি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের মুসলিমদের প্রয়োজন ছিল একটি রাষ্ট্রের; অথবা নিদেনপক্ষে

কোনো একটি রাজ্যের, যেখানে মুসলমানরা নিজেদের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং আপন বিশ্বাসের সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পাবে।

১৯৩৮ সালে ইকবালের মৃত্যুর পর সেই কাংখিত দেশ সৃষ্টির দায়িত্ব বর্তায় আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর। বহু মানুষ ইকবালের জানাজায় অংশ নেন, আমার পিতা ছিলেন তাদের একজন।

ইকবাল একজন ভাববাদী মানুষ, তথাপি কুরআনের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবন যাপনের উপায় সম্পর্কে তিনি মুসলমানদের বাস্তব দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। জিন্নাহও প্রয়োগবাদের সাথে ভাববাদের সন্মিলন করেছেন।

> 'কিছুটা বিধিবদ্ধ ও খুঁতখুঁতে, খানিকটা নির্লিপ্ত ও কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ তথা প্রশান্ত অহংকার তাঁর ভেতরকার অকৃত্রিম ও আকুল মনন, সংবেদনশীল ও স্নেহময় অনুভব, শোভন ও হৃদয়গ্রাহী স্বভাবকে ঢেকে রাখে; তাঁর পার্থিব প্রজ্ঞার অবশ্যম্ভাবী পবিত্রতা ও নির্মলতা এক নম্র ও মহান ভাববাদকে লুকিয়ে রাখে'-

লিখেছেন কংগ্রেস পার্টির প্রথম নারী সভাপতি সরোজিনী নাইডু।

শুরুতে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির সদস্য হিসেবে জিন্নাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত এবং অখন্ড ভারতের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরে তিনি মোহন দাস গান্ধীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কে যখন ইসলামি খিলাফতের অবসান ঘটে, তখন গান্ধী তা পুনর্বহালের আন্দোলনে নেতৃত্বে প্রদান করেন; তিনি এটাকে ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ করার এক উপায় হিসেবে দেখেন। কিন্তু জিন্নাহ এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেস নেতা জওহর লাল নেহেরুকে অপছন্দ করতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, নেহেরু ব্রিটিশ ভাইসরয় লুই মাউন্টব্যাটেনের সাথে নিজের ঘনিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে জিন্নাহ কর্তৃক প্রণীত আইনগত সাংবিধানিক পন্থায় বিশেষ কমিশন নিয়োগের কোনরূপ সদিচ্ছা মাউন্টব্যাটেনের ছিল না। মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনা নেহেরুর সাথে এতটা অন্তরঙ্গ ছিল যে, পরবর্তী সময়ে অনেক পাকিস্তানি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফলে ব্রিটিশ নীতি হিন্দুদের পক্ষে চলে যায়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহর লাল নেহেরু, মোহন দাস গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলিম সদস্য মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি পরে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন - এ চারজন ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো নেতা। যদিও তাদের প্রত্যেকেই ভারতের জনগণের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা লালন করতেন। গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁরা একইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে, তাদের

সৃষ্ট নতুন দেশগুলো ধর্মনিরপেক্ষ হবে না, বরং ধর্ম সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গান্ধী বলেন–

‘যারা বলে ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, তারা জানে না ধর্ম কী।’

তিনি মনে করতেন ধর্মহীন রাজনীতি অনৈতিকতার নামান্তর। কয়েক বছর পর, ১৯৪৮ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানে প্রদত্ত বক্তৃতায় জিন্নাহ এ কথা পুনর্ব্যক্ত করেন–

‘আমরা অবশ্যই বিশ্বের কাছে সত্যিকার ইসলামি ধারণার আলোকে রচিত মানবিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করব। মুসলমান হিসেবে এভাবে আমরা আমাদের মিশন পূর্ণ করব।’

জিন্নাহ ও গান্ধী উভয়ই বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুবাদের মোকাবিলায় ধর্ম কর্তৃক প্রচারিত মমতার বাণী এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হতে পারে।

খিলাফত আন্দোলনের পর ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে। ১৯২০ এর দশকের শেষভাগ থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লড়াই এর জেরে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন কর্তৃক অবাস্তব দাবির সূচনা হতে থাকে। অধ্যাপক ফ্রান্সিস রবিনসনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এরূপ একগুঁয়েমির অর্থ হচ্ছে-

‘সব ধরনের চেষ্টার পরও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গঠনে ব্যর্থতার জন্য হিন্দু পুনরুত্থানকামীরাই অধিকতর দায়ি।’

অখন্ড ভারতে মুসলমানরা নিরাপদে থাকবে, এমন কথা জিন্নাহ আর কখনো বিশ্বাস করতে পারেননি।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, লাহোরে মুসলিম লীগের এক সভায় দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে জিন্নাহ সম্মতি প্রদান করেন; যার একটি হিন্দুদের জন্য, অন্যটি মুসলমানদের জন্য। আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন যে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের আসল প্রকৃতি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে, তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। শাব্দিক অর্থে ধর্ম বলতে যা বুঝায়, এ দুটো ধর্ম ঠিক সে অর্থে কোনো ধর্ম নয়। বরং এ দুটি একেবারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থা। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটি অভিন্ন জাতীসত্ত্বা গড়ে তোলার ধারণা দিবাস্বপ্ন বৈ কিছু না। তিনি ঘোষণা করেন–

‘হিন্দু ও মুসলিম দুটি ভিন্ন দর্শন ও সামাজিক প্রথার অন্তর্গত। তাদের রয়েছে সতন্ত্র সাহিত্য ধারা। তারা একে অপরের সাথে বিবাহ-শাদী এবমনকি একত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্তও করে না। বাস্তবে তারা এমন দুটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ধারক ও বাহক, যা বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ে এদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি-ই

ইতিহাসের একেবারে স্বতন্ত্র উৎসসমূহ থেকে নিজেদের অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছে। তাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মহাকাব্য, উপাখ্যান ও মহানায়ক। প্রায়ই দেখা যায়- যিনি এক পক্ষের কাছে বীরপুরুষ, তিনি অন্য পক্ষের নিকট শত্রু হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে একজনের জয়-পরাজয় অন্যজনের ঠিক বিপরীত। যদি এমন দুটি জাতিকে একক রাষ্ট্রের অধীনে যুক্ত করা হয়, যেখানে একদল সংখ্যালঘু এবং অন্যদল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহলে তা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ, হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের সরকার যে অঙ্গিকেই গঠন করা হোক না কেন।'

সে সময়ে, দুনিয়ায় তখনও গণতন্ত্র বিকশিত হচ্ছিল মাত্র এবং মানুষ তখনও বিশ্বাস করত না যে এ ব্যবস্থায় ভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকা আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতার পটভূমিতে মুসলিম লীগের এ সভা থেকে 'লাহোর প্রস্তাব' নামক ঘোষণায় এক ভারতবর্ষের ধারণা প্রত্যাক্ষান করা হয়। সেইসাথে দাবি করা হয় যে,

'ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বের অঞ্চলগুলো, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলোকে একসাথে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হোক, যার মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্য হবে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম। এর সাত বছর পর পাকিস্তান জন্ম লাভ করে। যদিও এটিজিন্নাহর অভিযোগ অনুসারে সেটি ছিল 'পোকায়-খাওয়া' একটি রাষ্ট্র। সেখানে পাকিস্তান সমর্থকদের ধারণার তুলনায় অনেক কম এলাকা সংযোজিত হয়। এক হাজার মাইল ভারতভূমি দ্বারা পৃথকৃত উপমহাদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দেশ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান নামে গঠন করা হয়। বিশাল সীমানার পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দুটিকে দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এরপর মুসলমানদের পাকিস্তানে, আর হিন্দু ও শিখদের ভারতে স্থানান্তরের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্তত দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার এক চাচা সে সময় পাঞ্জাব সীমান্ত ক্রসিং রক্ষা করছিলেন। তিনি বলতেন, ওই ছয় সপ্তাহে যে রক্তপাত তিনি দেখেছেন, তা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টে জাপানের বিরুদ্ধে চার বছরের যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি নির্মম। এমন নিষ্ঠুর হত্যালীলা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হতো না। এ সময়ে য দুই দেশে দশ লাখের বেশি মানুষ হত্যাকান্ডের শিকার হয় বলে ধারণা করা হয়। পার্টিশন এক্ট অনুসারে এক কোটি ২০ লাখের বেশি লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। তাদের নতুন দেশে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। ফলে গড়ে উঠে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু শিবির। এ হত্যাযজ্ঞে যারা বিধবা ও অনাথ হয়ে পড়েছিল, তারা হাতের কাছে যতটুকু বিষয়-সম্পদ পেয়েছে, তা নিয়েই পা বাড়িয়েছে অজানা গন্তব্যের দিকে। এতে অসংখ্য পরিবার ও কমিউনিটি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। নতুন পরিবেশেও তারা ছিল আগন্তুক, এমনকী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতও। মার্কিন

ফটোগ্রাফার ও যুদ্ধ-বিষয়ক প্রথম মহিলা সংবাদদাতা মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট, দেশভাগকে ‘মানব দুর্দশার এক বিশাল মহড়া’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি যতটুকু পড়পশোনা করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, সেইসময়ে মানুষের ভোগান্তি ছিল হৃদয়বিদারক। সীমান্তে কর্মরত পাকিস্তান আর্মির সদস্য, ষোল বছর বয়সী এক বালকের ভাষ্যমতে,

> ‘হিন্দু, শিখ ও মুসলিম সব পক্ষই তখন পাশবিকতায় লিপ্ত হয়। আমি ট্রেনে করে এমন মানুষদেরও আসতে দেখেছি, যাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে ছিল ধর্ষিত নারী ও চরম ভীত সন্ত্রস্থ কচি শিশুরা। মনে পড়ে, সে সময় আমি ভাবতাম- এর নামই কী স্বাধীনতা?’

এ সময় সিমলায় আমার তিন চাচা বসবাস করতেন। বিশৃঙ্খলার মাঝে তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তাদের আর কখনো খুঁজে পাইনি। ভয়ানক আতঙ্কের মাঝেও প্রায়ই এমন কাহিনি শোনা যেতো- মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের কাছ থেকে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা লুকিয়ে রেখেছে। একইরকম গল্প বেঁচে যাওয়া হিন্দুদের কাছ থেকেও শোনা যেত। এমনই একজন হলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের জং এর অধিবাসী কোরেকী সাহেব। তিনি বহু হিন্দু পরিবারকে গোপনে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। পরে তাদের রক্ষা করার অপরাধে তিনি ‘বেঈমান’ সাব্যস্ত হয়ে নিজ মুসলিম সাথীদের হাতে নিহত হন।

দেশজুড়ে তখন যে পাগলামি ঘটেছিল, তা ছিল এক চরম উন্মাদনা। এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করেনি। এটা কী ইংরেজ শাসন অবসানের প্রতিক্রিয়া? নাকি বহু বছরের চেপে রাখা হতাশার বহিঃপ্রকাশ? ভারতীয় জনগণের মধ্যে এরূপ বিভেদ ছিল ইংরেজদের জন্য কাংখিত বস্তু। তারা এই বিভেদকে সক্রিয়ভাবেই জিইয়ে রাখে। ১৮৬১ সালে ভারতের আসন্ন ভাইসরয় হিসেবে আর্ল অব এলগিনকে জানানো হয় যে,

> ‘এক পক্ষকে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা ভারতে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রেখেছি এবং আমাদের অবশ্যই তা অব্যাহত রাখতে হবে।’

দেশভাগ পরিকল্পনাটি তাড়াহুড়ার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। এতে এক বিপদজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তা ভয়াবহতার দিকে গড়ায়। আর এর সময়ক্ষণ নির্ধারণের দায় ব্রিটিশদেরই অত্যধিক।

যাহোক,, মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা কার্যত যাবতীয় প্রতিকূলতা ও ভারতের প্রভাবশালী কংগ্রেস পার্টির তীব্র বিরোধীতার মুখেও এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। তারা একটি নতুন দেশের জন্ম দেয়। শুরুর বছরগুলোতে যদিও ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলাম, তথাপি পাকিস্তান সৃষ্টির বৈপ্লবিক উদ্যোগ আমাদের চালিয়ে নিতে সক্ষম হই।

পাকিস্তানে কখনো গণতন্ত্র বিকাশ লাভের সুযোগ পায়নি। কারণ, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ মৃত্যুতে সবাই দিক হারিয়ে ফেলে। যে সময়ে বিশ্ব ছিলদুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রভাবিত; পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে। দুভাগ্যজনকভাবে এটাও আমাদের জন্য সংকট হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর হাতে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মারা যান।[২] তার হত্যাকারী ছেল একজন আফগান। সে কাশ্মীর ভাগের বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারেনি। তার মতে পাকিস্তানের উচিত ছিল কাশ্মীর ফিরে পাবার জন্য যুদ্ধ করা। সে সময় অনেকেই তাঁর হত্যাকান্ডের ঘটনায় আরও অশুভ কারণ, খুঁজে পায়। এর মধ্যে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান বিষয়ে পাকিস্তানের উপর মার্কিন চাপ প্রয়োগ। তখন থেকে জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কখনো সন্তোষজনক ছিল না, যদিও সরকারের বেলায় সম্ভবত তা বলা যাবে না। তারপর ৯/১১ হামলার পর সম্পর্ক আরও খারাপের দিকে গড়ায়। এরপর তো এরা খারাপ!

ভারত- স্বাধীনতার প্রাথমিক বছরগুলো প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্থিতিশীল পরিবেশে কাটাতে সমর্থ হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ দপ্তর পরিচালনা করে গেছেন। আর এদিকে আমরা ধীরে ধীরে পিছলে যেতে থাকি। পালাক্রমে সামরিক ও বেসামরিক শাসন চলতে থাকে। তারা কখনোই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিপক্কতা অর্জনের সুযোগ দেয়নি। অবশ্য আমাদের অন্য সমস্যাও ছিল। এর পেছনে পাকিস্তানি অভিজাত ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভাজনও বৃহৎ অংশে দায়ি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চিন্তা ধারণ করা হয় অবিভক্ত ভারতে। যদিও অধুনা ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য উত্তর প্রদেশেই এ তত্ত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের শিকড় প্রোথিত হয়, তথাপি পাকিস্তান আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এসব অঞ্চল শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী, যেমন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জনগণ, ইরানের ভেতর পর্যন্ত চলে যাওয়া মরুভূমি অঞ্চলে বেলুচ জনগোষ্ঠী এবং আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী উপজাতিয় এলাকায় পশতুনরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ, খুঁজতে থাকে। এর পরিণতি ছিল চরম বিপর্যয়কর। পাকিস্তান, বিশেষ করে এর সেনাবাহিনী পাঞ্জাবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাই উল্লেখিত জাতিগোষ্ঠীগুলো ভাবতো, তাদের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে এরা সবাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তা ছাড়া কাশ্মীর অঞ্চল নিয়ে বিরোধের সুত্র ধরে ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকেই ভারতের সাথে ‘যুদ্ধরত-রাষ্ট্র’ হিসেবে আমরা নিজেদের যাত্রা শুরু করি। তখন থেকেই দূষিত এই ক্ষত (ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ) পাকিস্তানের ক্ষমতা বলয়ে সেনাবাহিনীকে (বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে আগে

---

[২]. একই পার্কে বহু বছর পর ২০০৭ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা হয়।

থেকে বিদ্যমান সংখ্যাগুরু পাঞ্জাবিদের) অসম শক্তিশালী ভূমিকা রাখার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তবুও আমার বিশ্বাস যে, শুরুর দিকের অদম্য আশাবাদ ও উদ্দীপনার বদৌলতে আমরা এসব সমস্যা সমাধান করতে পারতাম; যদি পাকিস্তানে ইসলামের সাম্যতা, গণতান্ত্রিক ও নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারতাম, যা ছিল আমাদের পাকিস্তান সৃষ্টির মূল প্রেরণা।

ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষিত আমলাদের কাছে গণতন্ত্র সামান্য পরিমাণই মূল্য পায়, অন্ততা তা পকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা এমন এক ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করেছিল, যেখানে জনসাধারণকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দেওয়া হত। সাবেক ঔপনেবেশিক শাসকদের অনুকরণে এবং তাদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানসিকতা ছিল- 'সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করা যাবে না।' ইকবালের মতো দূরদর্শি বা জিন্নাহর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা কিংবা নেহেরুর দীর্ঘ মেয়াদ, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত রচনায় সাহায্য করে, এসবের অভাবে আমরা এক অনাকাংখিত কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হই। এটা কেবল আমাদের ব্রিটিশ রাজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রথম সুযোগেই মিলিটারি-সিভিল আমলাতন্ত্র আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ থামিয়ে দেয়। পাকিস্তান ১৯৫৬ সালের আগে পূর্নাঙ্গ সংবিধান রচনায় সক্ষম ব্যর্থ হয়। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালিদের ক্ষমতায় সমান অংশ দিতে রাজি ছিল না। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বড় ছিল। তারপরও তাদের সমান অংশ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'এক ইউনিট' কাঠামোর (যেখানে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়) মতো পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে বাঙালিদের মাঝে অসন্তোষের বীজ বপন করা হয়। অবশেষে পাকিস্তান দেশভাগের দিকে অগ্রসর হয়।

১৯৫৮ সালে দেশের ক্ষমতা দখল করার পর সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন এবং প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। তিনি দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গণ অস্থিরতার মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন এবং আরেক সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার স্থান দখল করে। আইয়ুব খানের শাসসনামলে পাকিস্তানে অনেক সমৃদ্ধি ও পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন চালু করেন, যাতে বিয়ে সংক্রান্ত কতিপয় আইনের আধুনিকায়ন করা হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টায় অল্পকিছু লোক উপকৃত হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ এর ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। তাই দেশে রাজনৈতিক স্থবিরতা বিরাজ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন অভিজাত শ্রেণিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই নগণ্য, অঞ্চলটি ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাইরে চলে যেতে

থাকায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমী শাসক শ্রেণি কর্তৃক সমান গণ্য করার ব্যাপারে অনিচ্ছাই মূলত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ। যদিও স্ব-বিরোধী, তবুও অর্থনৈতিকভাবে দেশ তখন এক সুবর্ণ সময় অতিক্রম করছিল। আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ইতিহাসে সর্বাধিক, যদিও অধিকাংশ মানুষ তখন অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল। জাতিগত অসন্তোষ বাড়া সত্ত্বেও প্রশাসনিকভাবে দেশ ভালোভাবেই চালিত হচ্ছিল। কারণ, জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞা থাকলেও ব্রিটিশরা আমাদের জন্য যথেষ্ট দক্ষ এক আমলাতন্ত্র রেখে গিয়েছিল।

লাহোরে জন্ম নেওয়া এক সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু হিসেবে আমরা বুঝতে পারি এবং মাতাপিতা আমাকে পরে বলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে যে আশাবাদের জন্ম নিয়েছিল, তা বেঁচে ছিল এবং সামরিক শাসনের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত তা বিকশিত হচ্ছিল। যেহেতু আমরা পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী পাঞ্জাব প্রদেশে বসবাস করতাম, তাই আমাদের পক্ষে দেশে বেড়ে উঠা অনেক বিপজ্জনক, এমনটা অনুমান করার কোনো সুযোগ ছিল না।

আমার জন্মের সময় পাকিস্তানে বয়স মাত্র পাঁচ বছর। লাহোরে এক সচ্ছল পারিবারের সন্তান হিসেবে আমি কেবল দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই আশা করেছি। আমি শান্ত মনোরম শৈশব এবং বড়ো বড়ো মাঠে খেলাধূলা করার স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তার মাঝেই বড়ো হয়েছি। যেখানে বড়ো হয়েছি, সেই জামান পার্কের চারিদিকে প্রচুর চাষাবাদের জমি ও খোলা ময়দান ছিল। সেখানে অল্প কয়েকটি বাড়ির বাসিন্দারা প্রত্যেকেই আমাদের আপন পরিবারের মতো ছিল। পুরো এলাকাটাই যেন ছিল একটা খামার বাড়ি। আমার নানার ভাই জামান পার্কের প্রথম বাড়িটি নির্মাণ করেন- তার নাম আহমাদ জামান। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় নানার পরিবারও এখানে স্থানান্তরিত হয়। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে এয়ার গান নিয়ে কবুতর শিকারে কিংবা খালে সাঁতার কাটার জন্য বের হতাম; আর বিকালে চাচাতো ভাইদের সাথে ক্রিকেট খেলা। খেলার নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। সাঁঝের আঁধার নেমে আসা অবধি আমরা খেলতাম। আম্মা দুশ্চিন্তা করতেন না। তিনি জানতেন, আমরা সারাক্ষণ পরিবারের সাথেই আছি। সেখানে টাটকা দুধের জন্য প্রত্যেক পরিবারই গরু বা মোষ পালন করত।

সেই জামান পার্ক আজকে লাহোরের কেন্দ্র। শহরের কাঠামো দ্রুত সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার শৈশবের সেই সবুজ ও খোলা মাঠগুলোর মধ্যে কেবল একটা ছোটো পার্ক-ই বাকি রয়েছে। এতো ঘরবাড়ি উঠেছে যে, এখনকার অধিবাসীরা আগের মতো আর একে অপরকে আর চিনে না। খালগুলো নোংরা ও দূষিত হয়ে গেছে, তবুও ছেলেরা এখনো সাঁতার কাটে সেখানে। লাহোরের পানি একসময় খুব সুস্বাদু ছিল, এখন এতটা দূষিত হয়েছে যে, পান করার আগে ফুটিয়ে নিতে হয়। লাহোর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে এক সহপাঠী বন্ধুর খামারবাড়িতে যেতাম। সেখানে আমি চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম শটগান ব্যবহার করে চৌদ্দটি তিতির শিকার করেছিলাম। এটাই আমার জীবনের

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাজ। সে খামারবাড়ি এখন লাহোরের এক উপশহর হয়ে গেছে। তার বুনো ও সবুজ মাঠগুলো কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এখন পুরো পাঞ্জাব প্রদেশে হয়তো হাতে গোনা দু-একটি সংরক্ষিত এলাকা পাওয়া যাবে, যেখানে একটি বন্দুকের সাহায্যে চৌদ্দটি তিতির শিকার করা যেতে পারে।

আম্মা প্রতিদিন আমিসহ সব বাচ্চাদের চাচাতো ভাইদের সাথে আধা ঘণ্টার জন্য নানীর সাথে দেখা করতে পাঠাতেন। তাঁর সান্নিধ্যের এসব সন্ধ্যা ছিল আমাদের সবচেয়ে উপভোগ্য সময়। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটতো, তার সবই তিনি জানতেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল সমস্যার সাথে তিনি জড়িত থাকতেন। আমরা তাঁকে এমন সব বিষয়ও জানাতাম, যা আমাদের মাতাপিতাও কখনো জানতেন না। আমার নানী তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছেন, সম্ভবত সে কারণেই একশত বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময়ও তাঁর সব মানসিক অনুষদ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর ছিল। হয়তো আরও বেশিদিন বেঁচে থাকতেন, কিন্তু ১৯৮৫ সালে যখন আম্মা মারা যান, সে ক্ষতি তিনি আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আমার আম্মা তাঁর সবচেয়ে ছোটো সন্তান ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এই সিদ্ধান্তেই উপনিত হয়েছেন যে, তাঁর যাবার সময় হয়ে গেছে। এরপর তিনি বিছানা ছেড়ে বের হতে অস্বীকার করেন। অবশেষে আম্মা মারা যাওয়ার তিন মাস পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাকিস্তানে পরিবারই সবকিছু। মায়ের ভূমিকাকে পবিত্রতা দান করে ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। মহানবির (সা.) ভাষায়,

‘জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।’

আর আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল আমার আম্মার। আমরা ছিলাম পাঁচ ভাইবোন; ছেলে কেবল আমি-ই। তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মা, পরিবারের জন্য নিজের সব সুখ হাসিমুখে কুরবাণী দিতে সদাপ্রস্তুত। মনে পড়ে, তাঁর মনে ব্যথা লাগতে পারে ভেবে আমি আমার জখম লুকিয়ে রাখতাম। আমার আট বছর বয়সে একবার চাচাতো ভাইদের নিয়ে এক জাম বাগানে হানা দিয়েছিলাম। হঠাৎ মালী এসে হাজির। গাছ থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে গাছের ডালের উপর পড়ে যাই। চোখা ডাল আমার উরু ভেদ করে কয়েক ইঞ্চি ঢুকে যায়। আর একটু হলে ধমনী ছিঁড়ে যেতো! যখন বাড়িতে নেওয়া হয়, আম্মাকে আমার ক্ষতস্থান দেখাতে চাইনি, কারণ, তাঁর কষ্ট চোখে দেখা আমার জন্য কঠিন ছিল। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা এতো গভীর ছিল যে, তিনি পছন্দ করেন না, এমন কাজ করাকে আমি ঘৃণা করতাম। ভালোবাসা এভাবেই শৃঙ্খলা আনয়ন করে। প্রতিদিন তিনি আমাকে স্কুলের হোমওয়ার্ক করাতেন, কিন্তু খেলাধুলার ব্যাপারে এমন একরোখা ছিলাম যে, পড়াশোনায় আমার আগ্রহ ছিল না। শুধু আম্মার চেষ্টাতেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তবে হোমওয়ার্ক ছাড়া আমার অপছন্দের অন্য কিছু করতে তিনি তখনো বাধ্য করতেন না।